

রঁদেভু

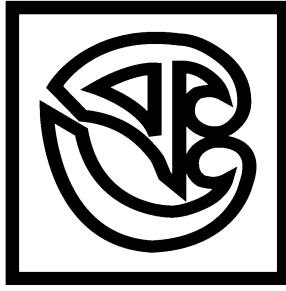
আদিবাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা



প্রকাশনায়

রঁদেভু প্রকাশনা পর্ষদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

বাংলা নববর্ষ ১৪১৩ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য
রুঁদেভূ ৬ষ্ঠ সংকলন সফল হোক



পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয়, রাংগামাটি

রঁদেভূ

ষষ্ঠ সংখ্যা

১লা বৈশাখ, ১৪১৩ বাংলা

১৪ ই এপ্রিল, ২০০৬ইং

প্রধান সম্পাদক

হরিপূর্ণ ত্রিপুরা

সম্পাদক

কর্মধন তনুচংগ্যা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়

কর্মধন তনুচংগ্যা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

২১৫ এস আলম কটেজ

১নং গেইট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

গুভেচ্ছা মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র-----।

মুদ্রণ : রেণু এ্যাড এণ্ড প্রিন্টিং,

সাতার ম্যানসন, ২য় তলা, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৮০৪৯০২

সূচী

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

ড. মাহবুবুল হক^১ মানব জীবনের

উৎসবের ভূমিকা

কবিতা

ময়ূখ চৌধুরী/মহীবুল আজিজ/হোসাইন

কবির/শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা/হাফিজ

রশিদ খান/ সবুজ তাপস/প্রমোদ বিকাশ

কারবারী।

প্রবন্ধ

কর্মধন তনুচংগ্যা- আমাদের ভাষা ও

সংস্কৃতিকে আমরাই বাঁচিয়ে রাখবো।

কবিতা

জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা/মংবাহেন/মংসাথোয়াই

মারমা/তর্ক ত্রিপুরা/বিপাশা চাকমা/উজ্জ্বল

কুমার তঞ্চঙ্গ্যা(মনিচান)/তপতাংশু

চাকমা(ব্যাবিলন)/রিনি চাকমা/অর্জিতা

খীসা/সুমন চাকমা/মোঃ আশিকুর রহমান

গল্প

কাইংওয়াই শ্রো- চাংক্রানপা-নি সাথচিয়া

(চৈত্রসংক্রান্তি গল্প)।

কবিতা

ফ্লোরিতা চাকমা

গল্প

তুমসাই শ্রো- রাক্সুসের গল্প

গান

রুনপাও শ্রো

সম্পাদকীয়

বিষ্ণু উৎসব

আমি ভালোবাসি জাদি নৃত্যের তালে তালে
নাদেং, গিলা খেলার ঐতিহ্যকে ধারণ করতে
বৈসুকের দিবস শুভতে বোতল নাচের প্রারম্ভিকতা
বিষ্ণুর ভাতৃত্ববোধ, ভালোবাসার
সিক্ত হৃদয়ের নাড়ী, দু'হাত বাড়িয়ে দেয়
চাংক্রানের লাঠি খেলা আর সাংখ্যায়ের পানি খেলা
পুরনো দিনের যত দুঃখ বেদনা রোগ শোক
ধুয়ে মুছে হোক পবিত্র
শুভ নববর্ষ

রঁদেভু ভালোবাসে সাহিত্য, সংস্কৃতিকে আর প্রশয় দেয় যেকোন
মননশীলতার সাথে সৃজনশীলকে, চিষুকের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে
আলুটিলা থেকে নেমে বগালেকের স্বচ্চ পানি দিয়ে গারো পাহাড়ের
রুগুণ সবুজ ভূমে সংস্কৃতি অধিকারে চাষাবাদ করতে চাই।

রঁদেভু পাঠকের জানার খোরাক মিঠাতে বিশ্বাসী। এজন্যে শুভকাজীর
মতামত সব সময় আশা করে। সাধ ছিল এবারের সংখ্যাটি স্বাস্থ্যবান
করার কিন্তু খরার রোদে তৃষ্ণার্থ হৃদয়ে তেমন এগুতে পারিনি। তবে
আশা করছি সামনে বর্ষায় আবার এগুতে পারবো।

এ সংখ্যা উৎকর্ষ সাধনে যে সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানান সাহায্য
দিয়ে মননশীলতার হাত বাড়িয়েছেন তাদের সকলকে নববর্ষের
শুভেচ্ছা সহ কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করছি। আর পাঠক আমার হৃদয়...

মানব জীবনে
উৎসবের ভূমিকা
ড. মাহবুবুল হক

উৎসব মানবজীবনে প্রাণচঞ্চল আন্দময়তার অভিব্যক্তি। তা জাতীয় জীবনে প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচায়ক। মানব জাতির সৃষ্টিশীল বিকাশের অন্যতম বাহন। কেবল অন্ন-বস্ত্র সংস্থানেই মানবজীবনে সার্থকতা আসে না। তার জীবনে চাই অবাধ মুক্তির আনন্দ। সে আনন্দ লাভের একটি উপায় উৎসব ও মানব সম্মিলন। বস্তুত যে জাতির উৎসব নেই সে জাতি নিজীব, ম্রিয়মান।

জীবন পরিক্রমার প্রতিটি স্তরে মানুষকে নানা কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। সেই বিচিত্র কর্মসম্পাদনার উপর ভিত্তি করেই এগিয়ে চলে সমাজ ও সভ্যতা। এ দিক থেকে মানব অস্তিত্বের মূলে রয়েছে নিরন্তর কর্মময়তা ও কর্মের সাফল্য। এই কর্মনির্ভর মানব জীবনে উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। তা কর্মের ক্লাস্তি ঘুচিয়ে দেয়, আনে সতেজ প্রাণের শিহরণ। দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে অবসিত মানুষের প্রাণশক্তি যখন শুকিয়ে আসে, যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে ‘জীবনের খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়’ তখন উৎসবের আয়োজন মনে আনে ফুর্তি, আনে মুক্ত জীবনের আনন্দ, সৃষ্টি করে নতুন কর্মপ্রেরণা। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবে মানুষে মানুষে হয় আত্মিক মিলন। মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, গ্লানি, দীনতা ও তুচ্ছতা ছাপিয়ে ওঠে উদার প্রাণের ঐশ্বর্য। উৎসবের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জাতীয় সংস্কৃতির, বৃহত্তর ও ব্যাপক রূপ। রবীন্দ্রনাথ মানব জীবনে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, হীন, একাকী- কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ- সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্রে হইয়া বৃহৎ- সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ আদিম আরণ্যক জীবন থেকেই মানুষ উৎসবগ্রবণ। তখন কৌম সমাজে যৌথ উদ্যোগে পশু শিকার শেষে সম্মিলিতভাবে সাক্ষ্য উৎসব হতো আগুন জ্বলে, নেচে গেয়ে, ভোজে মিলিত হয়ে। সভ্যতার রূপ রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবেরও ঘটেছে নানা রূপান্তর, ক্রমে ক্রমে তা পেয়েছে ব্যাপক ও বহুমুখী মাত্রা, স্থান ও কালের পটভূমিতে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। ঋতু, ঋতু পরিবর্তন, অয়ন, সংক্রান্তি ইত্যাদি সময় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে কিংবা শস্য, বৃক্ষ, সূর্য, চন্দ্র, ইত্যাদি জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কালে কালে গড়ে উঠেছে নানা প্রাচীন লোক- উৎসব। বাংলার ঐতিহ্যবাহী উৎসবের মধ্যে পড়ে নবান্ন, পৌষ পার্বণ, গাজন, গম্ভীর, টুসু, ভাদ্র, চড়ক, মহররম, ঈদ, নববর্ষ ইত্যাদি। তাতে প্রতিভাত হয় সমগ্র জাতির ভাব ও কর্মচেতনার নানা দিক। প্রায় সব উৎসবকে কেন্দ্র করেই আয়োজিত হয় মেলা। উৎসব ও মেলা তাই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত।

প্রকৃতি, পরিবেশ, ধর্ম ও জীবনধারার বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে উৎসবেও দেখা যায় নানা বৈচিত্র্য। প্রচলিত উৎসবগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ধর্মীয় উৎসব, ২. পারিবারিক

উৎসব, ৩. ঋতু উৎসব, ৪. জাতীয় উৎসব, ৫. আন্তর্জাতিক উৎসব। ঈদ, মুহররম, দুর্গা পূজা, বড়দিন, বুদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব। তবে তা কেবল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও যোগাযোগের মাধ্যমে পরিণত। জন্মদিন, বিয়ে ইত্যাদি পারিবারিক উৎসব। এসব উৎসবও পারিবারিক গাি ছাড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অভাগতদের মিলন-সমাবেশে পরিণত হয়। বর্ষবরণ, বসন্তোৎসব ইত্যাদি ঋতু উৎসব। এসব সর্বস্তরের মানুষের সমাবেশে বৃহত্তর সামাজিক উৎসবের রূপ নেয়। শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি জাতীয় উৎসব। এসব উৎসবের মধ্যে জাতীয় চেতনা, স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্যপ্রীতি ইত্যাদির বিকাশ ঘটে এবং জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, অলিম্পিক, বিশ্ব যুব উৎসব ইত্যাদি আন্তর্জাতিক উৎসব। এ ধরনের উৎসবের মাধ্যমে সংকীর্ণ জাতিত্ববোধের বাইরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সংহতি বাড়ে। শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা বিকশিত হয়। এ ছাড়া নানা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানমালাও উৎসব হিসেবে বিবেচ্য। চলচ্চিত্র উৎসব। কর্ম, চিন্তা ও কর্তব্যের বাঁধনে আমাদের জীবন আটপেট্টে বাঁধা। তার ওপর দারিদ্র্যের পীড়ন, সামাজিক নানা সমস্যার যাতাকলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন হয়ে পড়েছে ক্লিষ্ট। ব্যক্তি স্বার্থ-সর্বস্বতা, বিভেদের মানসিকতা, পারস্পরিক হিংসা ও ঈর্ষাকাতরতা আমাদের জীবন মুখ্য স্থান করে নিয়েছে সাম্প্রতিককালে। এই অবস্থায় প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাটে যন্ত্রণায়, হতাশায়, চিন্তায়, কাটে সতর্ক ও তটস্থ হয়ে। এই অবস্থায় উৎসব দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার উর্ধ্বে এক আনন্দময় বৃহত্তর দিকে আমাদের টানে; জীবনযাত্রার কঠিন অনুভবকে সাময়িকভাবে হলেও ভুলতে সাহায্য করে। জীবনে আনে নতুন ছন্দ, স্পন্দন, অন্তরে বইয়ে দেয় নবতর আনন্দদোলা। উৎসব কেবল মানব-সম্মিলনের আনন্দ দেয় না, প্রানের ক্ষুরণ ঘটিয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে সতেজ রাখে, দেয় নব নব কর্মপ্রেরণা। উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের সৃজনশীলতারও নানা প্রকাশ ঘটে। রচিত হয় সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চলচ্চিত্রের কত না সম্ভার। উৎসবের অর্থনৈতিক উপযোগিতাও কম নয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক তৎপরতা চলে তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক মানুষ উপকৃত হয়। উৎসব মানেই মানব-সম্মিলন। তাতে একের সঙ্গে যোগ হয় বহুর। অগণিত মানুষের সমাবেশ ও মিলন আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই উৎসব হয়ে ওঠে আনন্দ উৎসারী। দৈনন্দিন জীবনে যে মানুষ থাকে গণীবদ্ধ, জীবন-সংগ্রামের অচ্ছেদ্য চক্রে বাঁধা, উৎসবে সামিল হয়ে সেই মানুষই অতিক্রম করে সংকীর্ণ জীবনের বৃত্ত নিজের মধ্যে অনুভব করে বৃহত্তরে ব্যঞ্জন। উৎসব মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করে, হৃদয়কে করে প্রসারিত। উৎসব সঞ্চারিত করে অপার আনন্দ, দেয় নবতর চেতনা। আন্তর্জাতিক উৎসব সঞ্চারিত করে অপার আনন্দ, দেয় নবতর চেতনা। জাতীয় উৎসব জাতীয় চেতনাকে করে সংহত। আন্তর্জাতিক উৎসব প্রশস্ত করে শান্তি, মৈত্রী ও সৌহার্দের পথ। উৎসব মানুষের চৈতন্যে বিস্তার ঘটায় সুরচি ও শিল্পবোধের। মানুষের জীবনের ক্লাস্তি, হতাশা, নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও দুঃখ ঘোচাতে উৎসবের উপযোগিতা অসামান্য।

সুন্দরী নয়, সুন্দরের জন্যে

ময়ূখ চৌধুরী

১.

প্রথম দেখায় ছিলো কি-যে-
চোখে তার বিদ্যুতের ফণা ।
অতিসচেতন ছিলো নিজে,
মাকড়সার মতো জাল বোনা ।
বিপরীতে কালো মৌমাছি
মরণের গান ধরে জালে ।
এখন আমি যে রকম আছি
ছিলাম কি আর কোন কালে?
আগুনের কাছ থেকে দূরে,
তবু কেনো পুড়ে যায় ঘর!
কেনো গান গাই সেই সুরে-
জেগে ওঠে ঘুমন্ত কবর ।
সোনালি আগুনে যদি জ্বলে
অবশিষ্ট থাকে আর কিছু?
নামের সুরভি মর্মভলে,
অহংকার মাথা করে নিচু ।

২.

সেই এক দুপুর বেলা ছিলো,
সূর্য নয়, চাঁদ জ্বলেছিলো ।
ছিলো গান কবিতা এবং
রাগিনীর সবটুকু রং,
কালো অক্ষরের মতো চোখে
মূলকথা হয়েছে বরং ।
দু'জন পৃথিবী মুখোমুখি-
বুঝে গেছে কেউ নয় সুখী ।
তোমার নামের নদী এসে
আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
সেই এক দুপুর কেনো মেশে
দক্ষিণের জলের শয্যায়!
চেউয়ের বালিশে মাথা রেখে,
সারারাত জেগে জেগে থেকে
কখন সকাল হবে ভাবি,
খুঁজে পাবো দুপুরের চাবি ।
এখনও দুপুর আসে রোজ,
তবু সেই দুপুরের খোঁজ!
এ জীবনে ফুরোবে কি আর?
আমি ছায়া বিকেল বেলার ।

দূর থেকে দেখা

মহীবুল আজিজ

দূর থেকে দেখা গিয়েছিল ছায়ার মত
সঙ্গে নিয়ে এলে রোদ
রোদে ছায়া নিভে গেল
ফের নেমে এলো অন্ধকার
অন্ধকারেও হারিয়ে গেল ছায়া
তুমি কি ছিলে- রোদ নাকি ছায়া
এখন যা-ই হোক কোথায় খুঁজি
নাকি তুমি ছিলেই না
শুধু রোদ ছিল বা শুধুই ছায়া
নাকি রোদের ছায়া অথবা ছায়ার রোদ ।

হোসাইন কবির

পথরেখা

যে পথে পুরনো দিনের গান শুনে বাড়ি ফিরতাম
আজ সেসব পথই বাঁশি হয়ে করুণ সুরে বাজে
পথে পথে পদচিহ্ন অচেনা অজানা
কোন পথ খোলা নেই
শুধুই আঁধার সুরহীন সময়ের
অস্তিত্বের সবটুকু জলরঙ আলপনায় সমুদ্রের কল্লোল
চারিদিকে সতর্ক সংকেত- 'সোয়াচ অব নো গ্রাউণ্ড'

সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত

ভাঙনে চিড় খাওয়া বৃকের পাজর হা হয়ে আছে
তবু দুর্বাসাদা দুধরঙ খেলা করে হৃদয় জল-অরণ্যে ।

ভাবি,

পুরাতন সব কথা পরিণয়সূত্র গাঁথা-

যেকোন দিবস

টুকরো সময়

সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত- কোন কিছু সত্য নয় ।

হে মৎস্য কন্যা বেহুলা বাংলার-

প্রদীপ্ত আকাশ হয়ে ঢেকে দাও

এই মাটির শরীর ।

জুম্মবি: রাঙামাটির আঁকাবাঁকা পথে

শ্রীবীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

মনোরম নিসর্গ শোভিত-রাঙামাটির আঁকাবাঁকা পথে-

হাঁটে গেলেই সারাবেলায় দেখা হবে জুমিয়া ললনার সাথে ।

শেলোয়ার-কামিজ পরিহিতা, কাঁধে ওড়না, ঘরে বোনা রাঙা খাদি ।

চকিত, চঞ্চল, ভীৰু হলেও তার চাহনিতে যেন সে বড় আশাবাদী ।

প্রত্যন্ত গ্রামের জুম্মবি, প্রতিযোগিতায় নেমেছে শহুরে মেয়ের সাথে ।

জুমে যে ফসল ফলে না আর-বাঁচবার জন্য সম্মল নেই যে তার হাতে!

পিতা-মাতা, ভাইবোনেরা এখনো রয়েছে পাহাড়ের জুম ঘরে

টাকা নিয়ে ফিরবে জুম্মবি-দিবারাত্রি তারই অপেক্ষা করে!

এনজিওর পরিচালক ও অন্য অফিসের কর্তা আশা দিয়েছিল তারে চাকরি দিতে ।

আশায় বুক বেঁধে বারংবার যোগাযোগ রেখেছিল তাদের সাথে ।

চলনে, বললে, চাহনিতে তার ফেলে আসা চম্পকনগরের কারুকাজ!

আশ্চর্য হলেও সত্যি, তার দেহে এখন আধুনিক চলচ্চিত্রের নায়িকার সাজ!

ইনটারভিউর দিনেই জানল জুম্মবি, তার দেহ ফিটনেসের আরো হবে পরীক্ষা,

চাকরি হলেই কাজের মাঝে তাকে হতে হবে ঠিক সিনেমার নায়িকা ।

মডার্ন ষ্টাইলে কর্তারা তার দেহলাবণ্য নিয়ে করছে কিসের ইঙ্গিত!

জুম্মবি-তা বুঝতেই পারে-যত অফিসে হয়েছে ইনটারভিউ, সবখানে ঐ একই ইঙ্গিত ।

কত কিছু হারিয়েছে জুম্মবি-জুম, জমি, সুন্দর বনাঞ্চল-

কোন মতে টিকিয়ে রেখেছে এই দেহ-মন, যা তার একমাত্র সম্মল ।

যে দেহের ধমনিতে জুম্ম-বিপ্লবী শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে অবিরাম,

যে দেহ বাঁচাবার তরে জুম্মবি শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে অবিরাম,

যে দেহ বাঁচাবার তরে জুম্মবি রাত দিন করছে কঠোর সংগ্রাম,

সে দেহের শালীনতা, মর্যাদার বিনিময়ে চাকরি আর অর্থ কোনমতে কাম্য নয়-

এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ জুম্মবি, ইনটারভিউর দিনেই ডিসিশান লয় ।

শেলোয়ার-কামিজের আড়ালে লুকানো, জুম্ম জাতীয়তাবাদের সুতীক্ষ্ণ, ছুরিকা-

কর্তাদের বুকে নিক্ষেপ করে জুম্মবি বার বার করিল আত্মরক্ষা!!

(তাই) চাকরি আর হলো না তার কোথাও । না এনজিওতে, না সরকারি অফিসে-

এখনো হাঁটে জুম্মবি-রাঙামাটির আঁকাবাঁকা পথে বিপ্লবী-বিদ্রোহী নায়িকার সাজে!!

দ্রবীভূত অহংকার

হাফিজ রশিদ খান

লিখেছে কে যেনো তোমার সুন্দর নাম
সোনার অক্ষরে ছাপা ডায়েরির একটি কোণায়

চকিত দৃষ্টিতে দেখে জেগেছে ক্ষত্রিয়ক্রোধ
দিয়েছি সমস্ত মদ ঢেলে ওর উপচানো পেয়ালায়

অনাহারী কুকুরের মতো শব্দে-শব্দে
খেলো সে নিষিদ্ধ ও-পানীয়

ওই মাতাল কবিকে তাই দিচ্ছি আজ
জড়ো করা আমার সমস্ত অহংকার...

পাখিসব জানে, মেয়েটি জানে না

সবুজ তাপস

শৈল সিঁড়ি বেয়ে
সে যায় সন্ধ্যায় ঝরনায়,
আমি আছি কাছাকাছি ঝোপের ভেতর,
পাতাদের ফাঁকে তার দিকে
ছেড়ে দিই দু'চোখ আলোক;
পাখিসব জানে, মেয়েটি জানে না।

উচাটন মন জলে মেশে
অনায়াসে তার দেহে নামে,
ঠোঁটে চুমু কাটে স্বরবৃন্তের দোলায়,
ফড়িঙের মতো চুলের বনে লাফিয়ে
হাঁপিয়ে ত্বরিত ঢুকে যায় কলসিতে;
পাখিসব জানে, মেয়েটি জানে না।

আরেকবার জাগি উঠ, বীর রুণু খাঁ

প্রমোদ বিকাশ কারবারী

জাগি উঠ

জুম্ম বীর, ও রুণু খাঁ ।

সা রিনি

তর সেই তুলো দেহ্

তর সেই সাতরং স্বব'নর

হেল্ মুরা দেহ্ ।

সা আর'

তর্ সেই লারেই-সেয়্যা

সি-ধ্যা, কাম্মুআ

জুম্ম মুরল্যার

শো-ঘাম'র ফল-

শূধা, ঘচ্যা, ধান,

এচ্যা কল'গর ওউরুনে

দুর'ঝার' বান্দ'রুনে

খা-দন, নে-যাদন গন্তন ছারঝার ।

সেন'দ্যায়

ন যেচ্ আর ঘুম,

ন গরিচ্ দেরী;

যুগ্ যুগ'র ঘুম ভাঙি

জাদরে বাজেয়্যা পুরুচ্

ও-রুণু খাঁ

ঘুম'স্তন আরেক্ষেপ্

জাগি উঠ তুই ।

আগুন'র শবৎ হেই

বেলান'র তেচ্ লোই

আগাঝ' বাজ'র বল্ লোই

জাদ'মান্ জাদ'বীর

ও-রুণু খাঁ,

এ মুরোর পত্তি গরৎ

তুই আরেক্ষেপে

জাগি উদি আয় ।

আয় তুই আরেক্ষেপ্

বিঝ' শেল্ বাজেইন্যায়

হিচ্চি সা- লে

তর সেই তাক্কোয়া ধনুআন ।

মোত্তোক, লেত্তোদোহ্,

নিল্চ, ধেং, বেচ্ হেমানু ।

আয় সা-লে আরেক্ষেপ

জাললি তুই

তর সেই রাঙা আগুনান্,

মোত্তোক, লেত্তোদোক্ ধ্যেই যাদোক্

মরার এহমানু ।

আর রাঙাত্তন আর রাঙা

হোই যোক ।

এই রাঙামাটি ।

তারপরে-এযাক্ লামি

কাজাসোনা হোলোৎ রোৎ

ফাগুনর রং, হাবা

তর সেই স্বর'নর

হেল্হেল্ মুরোদেজৎ ।

আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আমরাই বাঁচিয়ে রাখবো কর্মধন তনুচংগ্যা

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম’ ও ‘সমস্যা’ এই শব্দ দুটির মধ্যে অক্ষর, উচ্চারণ ও তাৎপর্যগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত ভিন্ন নয়। একে অপরের সামর্থক। যেমনটি আমি মনে করি। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে খবর রাখেন, লেখালেখি করেন সর্বপুরী গবেষণা করেন তারা হয়তো বিষয়টি আরও খুব সহজে আঁচ করতে পারবেন। তাঁর মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে যেসব লেখা বের হয় বিশেষ করে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ তাঁর মধ্যে পুরোভাগ বিষয়বস্তু শুধু অধিকার বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা নিয়ে। সুখের কথা, শান্তির কথা খুঁজে পাওয়া কেমন জানি দুস্কর। আসলে যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমস্যা সমাধানের পথ যদি খুঁজে বের করা না হয় তাহলে সেখানে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আজ শুধু দু’একটি বিষয়ের উপর নির্ভর নয়। যেখানে ভাষা, সংস্কৃতিও বাদ যায়নি। ধরা যায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম নতুনভাবে সংস্কৃতির আগ্রাসন শুরু হয়েছে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম এই পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। এখানকার আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় স্বকীয় জীবন ধারাই মূলত এই অঞ্চলের মূল আকর্ষণ। আজ নানাভাবে এই বৈচিত্র্যময়ের ছন্দপতন ঘটানো হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব আদিবাসী জাতগোষ্ঠী বসবাস করে তারা প্রত্যেকে নিজস্ব স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ভাষাসহ সংস্কৃতির নানান প্রণালী। আমি মূলত এখানে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

ভাষা হচ্ছে একটি জাতির প্রতিনিধি। আর তা জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে। তাই এত স্বাভাবিক যে অন্য ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মতো এটাকেও স্বয়ংক্রিয়বৃত্তি বলে মনে হয়। একটি শিশু যখন সামাজিকভাবে বেড়ে উঠে তখন সে বেড়ে উঠার সমস্ত উপকরণ এই ভাষা থেকে পেয়ে থাকে। ফলে তাঁর নিজের ভাষার সঙ্গে তাঁর সমাজ ও জীবনের সম্পর্ক খুব নিবিড়। ছোটবেলা থেকে একটি শিশু শুধু তাঁর ভাষার কিছু ধ্বনি বা শব্দ শিখে না, সে সাথে সে শিখে সেই শব্দের সামাজিক, পারিবারিক ও পারিপাশ্বিক সম্পর্কগুলো। সেজন্য আমাদের সবাইকে মাতৃভাষায় কথা বলতে হবে। আর এই জন্যে ভাষার প্রশ্নে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অন্যান্য মৌলিক দাবীগুলোর মতো আদিবাসীদের এটিই একটি প্রাণের দাবী হয়ে উঠেছে। কেননা একটি শিশু যখন শিশুকাল থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে তখন তাঁর শিক্ষা জীবনে তেমন আর অসুবিধায় পড়তে হয় না। যা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী শিশুরা স্কুল থেকে ঝরে পরার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারা। একটি আদিবাসী শিশু যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন সে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাষা ও পরিবেশের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। নিজের ঘরের (মাতৃভাষা) ভাষার সাথে যখন স্কুলের ভাষা মিলে না তখন সে স্বাভাবিকভাবে তাঁর লেখাপড়া করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আমি এমনও দেখেছি যে একটি শিশুকে একটি ক্লাসে ২/৩ বছর পর্যন্ত থাকতে হয়েছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের শিক্ষার হার দিন দিন শূণ্য কোটার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আমি একবার বাড়ি গিয়ে দেখি যে আমার ছোট বোন ৩/৪ টা ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছে। তারা ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত পড়ে। আমি লক্ষ করলাম বোন বললেন 'সূর্য পূর্ব দিকে উঠে' তখন তারাও বোনের সাথে সূর মিলিয়ে বললেন। বোন জিজ্ঞেস করল সূর্যকে চেন কিনা। তখন সবাই নিরুত্তর, চুপ। যখন আবার বলল কেউ সূর্যকে চেন না? তখন সবাই 'না' বলে মাথা নাড়ল। তখন আমি অবাক হয়ে যায় সূর্যকে এরা চিনে না! যখন বোন বলল '(বে-ল বা বেলানকে (সূর্যকে তনুচংগ্যা ভাষায় বে-ল বা বেলান বলে) চেন কিনা। তখন সবাই 'হ্যাঁ' চিনি বলে সম্মতি দিল। বোন রেগে গিয়ে তাদের বেত্রাঘাত করতে চেয়েছিল আমি নিষেধ করেছি। আমি জানি তারা নির্দোষ। তখন চিন্তা করলাম এই শিশুরা যদি ছোটকাল থেকে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার সুযোগ পেতো তাহলে তারা আজ 'সূর্য'কে খুব সহজে চিনতে পারতো, এবং জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে বলতে পারতো। সেরকম তারা হাতি, শালিক, ঘুঘু, ময়লাষ্ট্রিনে না কিন্তু আয়ত, সালিয়া, ক-অ, মনা বললে ঠিকই চিনে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কি দুঃখের বিষয় যেখানে আমরা ৫২ সালে ভাষার জন্য আন্দোলন করেছি এবং তারাই ধারাবাহিকতায় ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি সেখানে আমাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার জন্য এবং বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য আবার নতুন করে সংগ্রাম এবং আন্দোলন করতে হচ্ছে।

আমি আগেই বলেছি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত সকল আদিবাসীদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা। অনেক ভাষার মধ্যে বুঝার এবং লিপির নৈকট্য থাকলেও ধ্বনি ও উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে। ফলে তারা অনেক সময় বুঝলেও বলতে পারে না। যার ফলে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলতে পছন্দবোধ করে। এবং প্রত্যেকে নিজ মাতৃভাষায় কথা বলে। ক্ষুদ্র এই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আবার একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, গোত্র এবং অঞ্চল ভেদে তাদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য রয়েছে। যেমন ত্রিপুরাদের ভাষার নাম 'ককবরক ভাষা' আগরতলা ত্রিপুরা 'ককবরক' ভাষায় কথা বললেও লিপি ব্যবহার করে রোমান লিপি। আবার বাংলাদেশের ত্রিপুরা রোমান এবং বাংলা উভয়লিপি ব্যবহার করে। ফলে উভয়ের মধ্যে ভাষার পার্থক্য স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আবার ত্রিপুরাদের মধ্যে খাগড়াছড়ি ত্রিপুরা ও বান্দরবানের ত্রিপুরাদের মধ্যে ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে যা কথা বলার মধ্যে অঞ্চল প্রভাবটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। যেমন- ভাত খাবে কিনা?(বাংলায়)

মাই চানাই? (খাগড়াছড়ি)

মাই চামি-দে? (বান্দরবান 'উসুই')

আর তনুচংগ্যাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাষার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তাদের গোষ্ঠীগত বসবাস কিছুটা অঞ্চল ভেদে। যেমন কাপ্তাই-ওয়াগ্লা অঞ্চলে বসবাস করে কারবয়া গছার লোকজন, রাস্তামাটি রন্যা, ওগয়্যাছড়িতে বসবাস করে ধন্যাগাছার আর বিলাইছড়ি, রাইংখ্যাং অঞ্চলে বসবাস করে মো-গছার লোকজন এরকম তারা আরও অঞ্চল ভেদে বসবাস করে। তনুচংগ্যাদের গোষ্ঠীগত ভাষার পার্থক্য থাকলেও অঞ্চলে ভেদে কিন্তু ভাষার পার্থক্য নেই। বান্দরবান বালাঘটার মো ও ধন্যা গছার লোকজন একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করলেও তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ (মো-ধন্যা) ভাষায় কথা বলে। তনুচংগ্যাদের মধ্যে যে গোষ্ঠীগতভাবে ভাষার পার্থক্য রয়েছে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়।

যেমন-

তোমার নাম কি? (বাংলায়)।

ত নামান কি? (কারবয়া গছা)

ত নাঙান কি? (মো/ধন্যা গছা)

ত নাগান কি? (মংলা গছা)

এভাবে গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে তনুচংগ্যাদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শ্রো আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তনুচংগ্যাদের ঠিক উল্টো। তাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত নয় অঞ্চল ভেদে ভাষার পার্থক্য রয়েছে। একই অঞ্চলে নানান ভাষার সমিলতা, তোয়াঙ, টেং-সহ আরো অন্যান্য গোষ্ঠীর লোক বসবাস করলেও তাদের ভাষা কিন্তু এক। এক অঞ্চলের ভাষার সাথে অন্য একটা অঞ্চলের ভাষা মিলে না বললেই চলে। আগেই বলা হয়েছে শ্রোদের ভাষার পার্থক্য অঞ্চল ভেদে। আর এই অঞ্চলগুলি হচ্ছে থানচি কে তারা বলে 'চুংমা' বান্দরবান সদর 'আনক' রোমা 'কুমগুংচা' লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি অঞ্চলকে তারা বলে টুমরঙ, টুপরেঙ, টামছা। ফলে এই থেকে ধরে নেওয়া যায় অঞ্চলের ভিত্তিতে শ্রোদের ভাষার নাম ও পার্থক্য গড়ে উঠেছে। যেমন-

আপনার নাম কি? (বাংলায়)

এন্ মিঙ মিয়া চ(অ)? (বান্দরবান সদর)

এন্ মিঙ এয়ঙ না (হ)? (আলীকদম, রোমা, নাইক্ষ্যংছড়ি)

এন্ মিঙ এয়ঙ হোম চ (অ)? (থানচি)

মারমাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ভাষার পার্থক্য কিছুটা গোষ্ঠী এবং অঞ্চলভেদে। যেমন খাগড়াছড়ি মারমাদের ভাষার সাথে বান্দরবান মারমাদের ভাষা ধ্বনি ও উচ্চারণগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। বান্দরবান মারমাদের ভাষার মধ্যে যথেষ্ট বর্মী প্রভাব লক্ষ করা যায়।

যেমন-

আপনার নাম কি? (বাংলায়)

কোবাং না-মে আ-চালে? (খাগড়াছড়ি)

কোবাং না-মে যা-লে? (বান্দরবান)

ঠিক তেমনিভাবেও চাকমাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাষার পার্থক্য রয়েছে। শুধু কি আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী ব অঞ্চল ভেদে ভাষার পার্থক্য রয়েছে তা নয়, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটি আদিবাসীর সাথে অন্য একটা আদিবাসীদের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জানা বা বুঝা না থাকলে কেউ আঁচ করতে পারে না সে কি বলছে। এবং সে কোন ভাষায় কথা বলছে। তবে দুই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে ভৌগলিকগত কারণে একসঙ্গে বসবাসের ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে একে অপরের দু'একটি শব্দ ঢুকে গেছে। যেমন- চাকমা ও তনুচংগ্যাদের মধ্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ও বাংলা ভাষার কিছু শব্দ প্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু কথা বলার সময় তাদের নিজ ভাষার কোন ছন্দপতন হয় না। তবে চাকমা ও তনুচংগ্যা ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উভয়ে চাকমা ভাষা ও তনুচংগ্যা ভাষায় কথা বলে। একে অপরের ভাষা বুঝে কিন্তু সব সময় সঠিকভাবে বলতে পারে না। তাদের মধ্যে শব্দ ধ্বনি উচ্চারণ সর্বোপরি ব্যাকরণগত পার্থক্য রয়েছে।

এই যে উপরে ভাষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম তার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে 'ভাষার সমস্যা' গোষ্ঠী, অঞ্চল এমনকি সম্প্রদায়গত ভাবেও পার্থক্য দেখা যায়। আমি এইসব বিষয় এখানে উপস্থাপন করলাম একটা কারণে সেটা হচ্ছে 'আদিবাসীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা' যে আন্দোলন গোষ্ঠী, অঞ্চল ও সম্প্রদায়গত ভাষার পার্থক্য কারণে সাবধানতার সহিত আমাদের সামনে এগুতে হবে কারণ আদিবাসীদের মধ্যে লিপির সমস্যা একটা বড় সমস্যা।

এর মধ্যে একটা লক্ষ করার বিষয় যে (মায়ের ভাষায় পড়তে চাই ম্যাগাজিনে প্রকাশ) সব সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য একটা লিপি নির্বাচন করার দাবী উঠেছে। সে লিপিটি হতে পারে রোমান বা অন্য কোন একটা লিপি। এই লিপির মাধ্যমে আদিবাসীরা তাঁর নিজ মাতৃভাষার লেখাপড়া করবে। আর সবার গ্রহণ যোগ্য লিপিটি নাম হতে পারে 'পার্বত্য আদিবাসী জাতীয় লিপি বা পার্বত্য আদিবাসী লিপি' যেটা আমি মনে করি আর এই লিপির মাধ্যমে সবার মধ্যে একটা ঐক্যতা সৃষ্টি হবে। তবে এই লিপি নির্বাচন ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষিত সমাজের মানুষের কথা চিন্তা করলে হবে না যারা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের কথাও মাথায় রাখতে হবে। উপরের বিষয়টি যদি মান, বিজ্ঞান এবং বাস্তবসম্মত না হয় তবে তাঁর একটা বিকল্প পথও আছে। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যে গছাভিত্তিক ভাষাগুলো আছে তাদের নিজ ভাষাকে সমন্বয় করে সে জাতির জন্য একটা (Standard Form) প্রধান ভাষা নির্বাচন করতে হবে। সে ভাষা হবে সে জাতি বা সম্প্রদায়ের আসল ভাষা বা Standard Language. যেমন তনুচংগ্যা সম্প্রদায়ের যে সমস্ত গোষ্ঠী ভিত্তিক ভাষা গুলো আছে সে সব ভাষাকে এক করে তার মধ্য থেকে একটা Standard Form ভাষা সৃষ্টি করতে হবে। এই সৃষ্টিকৃত Standard Form ভাষাটি হবে তনুচংগ্যা সম্প্রদায়ের প্রধান ভাষা মানে 'তনুচংগ্যা ভাষা'। তখন এর গছা ভিত্তিক ভাষাগুলি হবে ঐ Standard Form ভাষার উপভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভাষাগুলোকেও এভাবে করা যায়। তবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলন নামে অপেক্ষাকৃত অনুগ্রহসর ও ক্ষুদ্রগোষ্ঠীকে এই ভাষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখে এবং সুযোগ বুঝে এক সম্প্রদায়ের ভাষা অন্য সম্প্রদায়ের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে এই মহৎ উদ্যোগটি হিতে বিপরীত হবে এতে কারো দ্বিমত নেই। এবং এই ভুলটি যদি আমরা করি তাহলে সেটা হবে একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় ভুল। আমি আশাকরি সমাজ চিন্তা বিদরা এই নিয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবেন।

ভাষার মাধ্যমে একটি জাতি তাঁর জাতির সংস্কৃতি ধারাকে ফুটিয়ে তুলতে এবং বাঁচিয়ে রাখে। প্রত্যেক বছর যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণু উৎসব হয় তাঁর মধ্যে একটি জাতির নিজস্ব স্বকীয় সংস্কৃতি ফুটে উঠে। এই সংস্কৃতি গড়ে উঠে ভাতৃস্ববোধ ভালোবাসা ও মৈত্রীর বন্ধনের মধ্যে দিয়ে। মারমাদের ঐতিহ্যবাহী পানি খেলা, ম্রোদের গো-হত্যা, লাঠি খেলা, ত্রিপুরাদের বোতল নৃত্য, চাকমাদের জুম নৃত্য, তনুচংগ্যাদের জাতীয় জাদি নৃত্য, গিলা খেলা, নাদেং খেলা, পাইসন, ঐতিহ্যবাহী তনুচংগ্যাদের পাঁচ কাপড় (পিনৈন্, মাদাকাবং, খাদি, সালুম, পা-দুরি) এইসব ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির উপকরণ ও উৎসবগুলি আদিবাসীরাই বাঁচিয়ে এবং টিকিয়ে রাখবে। এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতি নিজেকে জাতি হিসেবে বাঁচিয়ে বেং পরিচিত করে তোলার প্রধান বাহন। পৃথিবীতে যে জাতি ভাষা ও সংস্কৃতিহীন সে কখনো জাতি হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ একটি-জাতি তখনই জাতি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠে যখন তাঁর ভাষা ও সংস্কৃতি থাকবে। নয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় থাকবে না। সেজন্য আমাদের সবার উচিত অন্যের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজ মাতৃভাষায় কথা বলা এবং শ্রদ্ধার সাথে সংস্কৃতিকে লালন পালন করা। আর এর ফলে আমরা নিজ মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবো।

চির অমাবস্যা

জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা

পাহাড়ী বাতাসে এখনো ভাসে তাজা বারুদের গন্ধ
ছোপ ছোপ রক্তে পিচ্ছিল জনপদ
শ্মশানের আগুন যেন শিখা চিরন্তন
শ্যামল ঝোপের তলে জ্বলছে দাবানল
মৃত আর জীবনুতের পোড়া গন্ধে
লোলুপ হয়েনা আর শকুনের
চলছে মহোৎসব
উহু কী বীবৎস!

জলপাই রঙের অন্ধকারে এখনো শোনা যায় মরণ চিৎকার
পাহাড়ী বুকে এখনো তাক করা আছে
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সর্বশেষ মডেলের
সভ্যতা হস্তারক মারণাস্ত্র
পাহাড়েই রচিত হচ্ছে আধুনিক কালের
সর্ববৃহৎ বধ্যভূমি
উহু এ কী বিভীষিকা!

গিরিঝিরি ঝর্ণার বুকে বহে না
স্বচ্ছ শান্তি স্রোত
কর্ণফুলীর শিড়া বেয়ে
তীব্র বেগে নামছে জ্বলন্ত লাভা
আধুনিক শল্যচিকিৎসকের নিপুণ হাতে
পাহাড়ের ফুসফুস খুলে
লাগানো হয়েছে কামারের সচল হাপর
আর তার সম্মুখে জ্বলন্ত আইল্যা...
উহু কী জঘন্য!
পাহাড়ের প্রকৃতি কেমন বদলে গেছে
নেই বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডল বিষবাষ্প

অতপর বাংলাদেশ

(অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান স্যারকে ভালোবেসে)
মংবাহেন

চিরন্দিয়ার শেষে আমি সাম্যের তরুণ
কালের তরুণ ভেসে শ্বেত রুমাল এনেছি দেখ
কেমনে বুঝি পৃথিবীর অঙ্কিত দৌরাত্ম্য আজ
যান্ত্রিক পাড়ার বিপ্লব প্রয়োজন সে-তো বুঝি নাই
রক্ত রুমাল মহাসিঙ্কুকে রেখেছি উত্তরের নামে
শীর্ষ দুঃখিনীর কষ্ট গর্ভের স্ফীতি স্বাধীনতার দোহাই,
রাঙা ভাঙ্গা স্বপ্নে পুনশ্চ প্রতিমা
ও-তো আমারই বাংলাদেশ।
নবজাতকের সুখের গল্পটি প্রয়াত ধাত্রীর মগজে
পত্রিকার চোখে কিছু ধর্ষণ একটি মৃত্যু কিছু অপমৃত্যু
সরকার তত্ত্বের একটি করে বিজয়ের নৈশভোজ রীতিমত
পৈশাচিকতার প্রতিশব্দ জানি এই পৈশাচিকতাই ধাঁধা
মোন্দাকথা কুলখানি মৃত্যু অপমৃত্যু এবং নির্মম লজ্জার
গণতন্ত্রের মানস বর নিয়ত লাক্ষিত, লাক্ষিত ক খ অ আও,
রাঙা ভাঙ্গা স্বপ্নে পুনশ্চ প্রতিমা
ও-তো আমারই বাংলাদেশ।

গুরু'র বৈভব এবং প্রশ্ন

তোমার রাত আমার প্রস্তাবনায় কৃষ্ণপঙ্কের আগুন জ্বলে
সাঁতরায়ে আসে নিঃস্বার্থ-তন্দ্রা ভুলে
দাবীর মিছিলে শ্লোগান হয়ে ধরা দেয়
নিঃস্বর্গে স্বর্গীয় ফুল।
বক্ষ বনে আগুন লেগেছে আগুন ওগো বন্ধু
ওগো বন্ধু সম্মতি দাও মৌন গ্রহণ যৌবনের দহন
শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিও হৃদয় হৃদয় সমাবেশে।
পুণ্যের মহাপ্রস্থান যদি দেখ অনুরক্ত রাত্রে
অনুরাগের ফুল না ফোটে যদি অভিষিক্ত কালে
তবে ঈশ্বরকে প্রশ্ন কর, এ প্রলয় কেন?
ঈশ্বরকে বলো, বিলুপ্ত ঘটাও নর বা নারীর।

অমিত মিতাকে

মংসাথোয়াই মারমা (বাবু)

তোমাকে আজ চেনাই যাচ্ছে না-

তুমি কি সে মিতা

যার পায়ে নুপুর শব্দে-

মধ্যদুপুরে ঘুম ভেঙ্গে যেত

দঙ্ক জুম পাহাড়ের বজ্রস্রাত

বিমর্ষ, মলিনতা, ক্লান্ত শরীরে

যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতো অমিত

বাহ্ কি অদ্ভুত আনুষ্ঠানিকতা

সবুজ পাহাড় ঝিরি ঝরনা বনফুল

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে

আর তুমি তাকিয়ে আছে

দূর সমুদ্রে ভেসে উঠা

অর্ধনগ্ন প্রসাদে

গুণ্ড কামনা তোমার জন্যে

ত-বে, মনে রেখো ঐ মিতাকে ।

স্বপ্ন দেখি

তর্ক ত্রিপুরা

স্বপ্নে সবই দেখি, দেখি অনেক কিছু

যা হয়তো অকথ্য হিসেবে রয়েছে হৃদয়ের

মাঝে

আবার অনেক সময় তা ফুটে - উঠে অলক্ষ্যে

অনেকে স্বপ্ন দেখে বিশ্বকে নিয়ে

আবার অনেক জাতি ও দেশকে নিয়ে

যারা দেশ ও জাতির দুঃস্বপ্ন এগিয়ে

আসে সবসময়,

এই ধরনের মানুষ হয়তো এখনো আছে

আমাদের তা খুঁজে বের করতে হবে

যে বিশ্বশান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রগতিক

বাস্তবে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে...

এখনো আমি সে স্বপ্ন দেখি ।

দু'হাত বাড়িয়ে

বিপাশা চাকমা

ভালোবাসা শিশির, যা ক্ষুদ্র হলেও

মানুষের জীবনকে

ভাসিয়ে দিয়ে যায় ।

ভালবাসা? সে তো বৃষ্টি

আকাশকে জড়িয়ে ধরে বলে

ঝরে গিয়ে আকাশেই চলো যায় ।

গাছের ঝরে যাওয়া পাতা যেমন

ঝরে গিয়ে গাছের জন্য নিয়ে আসে বসন্ত ।

ভালবাসা হচ্ছে তাই

তোমাকে জীবনের শেষ সিঁড়ি থেকে

দুহাত বাড়িয়ে ফিরিয়ে আনলাম

ভালোবাসা জানে তো তা-ই ।

শান্তির খুঁজে

উজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য্য (মনিচান)

সীমানা আর কতদূর?

অনেকটা পথতো অতিক্রান্ত হলো

নদী, পাহাড়, সমুদ্র সেই কবে দিয়েছি পারি

অথচ পাওয়া হয়নি সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ঠিকানা

কেবল মনে হয় এই যেন কোন এক মরিচিকার পথ ।

চলার পথে পেয়েছি সুখ নামে

হাজারো আবেগ, আর মায়া ভরা স্মৃতি ।

কিন্তু দুঃখ কি পায়নি, কি বিষাদের স্বাদ?

দেখেছি সুনামি'র মত ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে

প্রিয়জন হারানোর আর্তনাদ ও হাহাকার,

দেখেছি হাসপাতালে কোন এক

ক্যান্সার রোগীর অসুখের অসহনীয় যন্ত্রনার দৃশ্য

উপলব্ধি করেছি বারংবার, দিয়েছি সাক্ষ্যনা

তবে পারিনি দিতে এক মুঠো সুখ ।

গ্রামের নির্জন প্রকৃতিকে ভালবেসেছি

চেয়েছি অনন্তকাল আলিঙ্গনে রেখে,

শান্তির সুবাস উপভোগ করতে ।

কিন্তু তা আর পাওয়া হলো কোথায়?

এক ঝাক শকুনের ঢলে আর নরপিচাচের জ্বালে

বন্ধি হয়ে যেন দুঃস্বপ্নের সাথে বসবাস

গোপন দীর্ঘশ্বাসে কেবল খুঁজি ।

মুক্তি আর শান্তির পথ ।

মুক্তি

তপতাংশ চাকমা (ব্যাবিলন)

গভীর রাতের নিঃসুপ্ত আঁধার
মানব শূন্য এই রাতে ।
বসে আছি আমি জেগে
ঘুম নেই চোখে-মুখে ।
আছে শুধু হাজারো চিন্তা
আর মনে জাগে শুধু ভয় ।
সবাই ঘুমিয়েছে শান্তিতে
জেগে আছি শুধু আমি একা,
হাজারো কষ্টের ভরা বুকে ।
রাতের নিঃসুপ্ততার মত আমার জীবন
আকাশের তারাদের মত নিঃস্বপ্ন ।
ইচ্ছে করে প্রাণ খুলে হাসতে
মনের সুখে গান গাইতে
কোথাও বা হারিয়ে যেতে
বুকে বিশ্বাস রাখি
মনে সান্ত্বনা নিয়ে থাকি ।
আর অপেক্ষায় থাকি ।
মুক্তির পথ চেয়ে ।

ছবি

রিনি চাকমা (চিক)

শহরের উষ্ণতম দিনে ভিজে চলা এই পথ
ভিজে দিয়েছে তোমাকে, আমাকে
এক ফোটা বৃষ্টির পানি যেন হাজার সমুদ্র
চূপসে গেছে সারা শরীর
এই আনন্দ কোথায় লুকাই বলা তুমি
হঠাৎ একদিন কাকভেজা ভোরে তোমার দেয়া গোলাপ
আমার সারা দেহ মনে আনন্দের দোলনা খেয়ে গেল
জীবনের ক্যানভাসে আঁকলাম তোমার ছবি
যার চোখ নেই, কান নেই, নাক ও নেই
আছে শুধু ছোট একটা মন
অজস্র রংয়ের মাধুরী মিশালাম
তবু কেন এত অচেনা মনে হয়
হ্যাঁ সেতেও শুধু ছবি কল্পনার...

পেবা তুমি মরে অর্জিতা খীসা

ম মনানদ বাজি থাই, ঐ এইল মুড়ো সেরে;
উড়ি যাই, ঐ মুড়োর কালা-ধূপ মেঘঅ সমারে;
ঝড় দি লামি এজে, আমা দেজর ভুইয়ো সেরে ।
পেবা তুমি মরে, ম স্বস্তা বোরে,
সেই এইল-পাগনা ধান সরা সেরে ।
পেবা তুমি ম মনানরে, কোন হিজিংওর জুমো সেরে;
চোরোহিস্তে মুড়োয় ঘিচ্ছে রান্যের ভান্সা মনোঘরর সাজি তলে
পেবা তুমি মরে,
এইল মুড়ো আগাজর তারা সমারে,
বৈজেগী পূর্নিমার জুন পহরত ।
সরেই দিস এ মনান, আমা দেজর মাদি সমারে
পেবা তুমি মরে,
দেশর ধুলানি সমারে,
চেঙে কাজলং-র পানিত ।
তমারে...ও মুই চেবার চাং, দেজর জাদর সমারে
আজা গরং তমারে বাপ-ভেই,মা-বোন উন সেরে
আমা বিজগত, দেজ মানযোর কদা সেরে ।

জানতে ইচ্ছে করে

সুমন চাকমা (রোস্ট্র)

এখনও আছ কি তুমি

পত্রঝরা বৃক্ষের ছায়াতলে আধো আধো রোদ্দুরে

যেখানে দেখেছি বছর কয়েক আগে ।

দু'চোখের দৃষ্টি মেলেছ নিসাড় মৃত্তিকার পানে ।

জানিনে, নাকি ঐ দূর নক্ষত্রের অন্য সৌরমন্ডলে

প্রত্যাশার আলোকিত বীজ বুনে

সময়ের স্রোতে ভাসে জীবন ভেলায়

ফোটায় ফোটায় অশ্রুবিन्दু বেয়ে যায় অবশেষে

চিবুক লেকে মাপ দেয়, আত্মহত্যা করে অভিকর্ষের টানে ।

গাছের তলায় সবুজ লতানো ঘাসগুলো তোমাকে দেখে

নিশ্চয় মুচকি হাসে?

হয়তো বিদ্রূপ করে কিছুটা, অথবা করে না ।

রাতের প্রলোভনে পেঁচারা বেরোয় যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে,

তবুও তোমাকে দেখেছি নিখর দেহে

আগের মতই দৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষার অবসানো,

ছেলের প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে এখনও আছ কি তুমি?

আমার বড়ই জানতে ইচ্ছে করে ।

তোমরা তাদের অধিকারকে রুদ্ধ করো না

মোঃ আশিকুর রহমান

আদিবাসী মেয়ে-

তোমরা আবার স্বপ্ন দেখ

স্বাধীন ভাবে চলার স্বপ্ন,

সূর্য উঠা ভোরে

জুম ক্ষেতে গিয়ে কাজ শেষে

নিরাপদ নীড়ে ফেরার স্বপ্ন

উৎসবের দিন এলে

ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়ে

নিজ নৃত্য করার স্বপ্ন

একোন তোমার করুনা নয়,

অধিকার-

জুম্ম জাতির সত্ত্বা নিয়ে বাঁচার অধিকার

তোমরা তাদের অধিকারকে রুদ্ধ করো না :

চাংক্রানপা-নি সাংচিয়া

(চৈত্রসংক্রান্তি গল্প)

কাইংওয়াই শ্রো

চাংক্রানপা-নি মানে 'চৈত্রসংক্রান্তির' দিন। এ দিনটি সবার কাছে পবিত্র, আনন্দের, উৎসবের অর্থাৎ পুরাতন বছর বিদায় নতুন বছরের আগমন। আর এ নতুন বছরকে বরণ করে নিতে পৃথিবীর বুকে চাংক্রানপা-নি-তে লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামে আর নানা আয়োজনে। এদিনে বিভিন্ন রকম উৎসব, পূজা-পার্বণ ও মেলা অয়োজন করা হয়। এটা দেখে থুরাই (স্রস্টা) নিজেই আনন্দ পান। এ পৃথিবী বুকে আনন্দ উপভোগ করার জন্য থুরাই ও তার সহধর্মিনী চাংক্রানপা-নি দুজন পাশা-পাশি এসে পৃথিবীর বুকে বসলেন। উপভোগ করলেন চাংক্রানপা-নি। কিন্তু চাংক্রানপা-নি লক্ষাধিক মানুষের ঢল দেখে থুরাই এর সহধর্মিনী চিন্তা করলেন যে, পৃথিবীতে এতগুলো লোক মারা গেলে কোথায় যাবে এবং কিভাবে থুরাই ফোং (স্বর্গরাজ্য) এ ওদের জায়গা সংকুলন হবে এ নিয়ে থুরাই এর সহধর্মিনী চিন্তার কোন কমতি ছিল না। তাই হঠাৎ করে এ বিষয়ে থুরাইকে প্রশ্ন করলেন। আচ্ছা থুরাই আমার তো রীতি মত চিন্তা হয় পৃথিবীর মানুষের জন্য এতগুলো মানুষ মারা গেলে আপনার রাজ্যে সবাই স্থান পাওয়া যাবে তো? তখন উত্তরে থুরাই সহধর্মিনীকে বললেন, দেখ পৃথিবীর সব মানুষ একদিন মারা যাবে ঠিকই কিন্তু আমার রাজ্যে সবাই এসে জায়গা পাবে না এবং আসতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর মানুষকে সবচেয়ে বিবেকবান প্রাণী হিসেবে আমি সৃষ্টি করেছি এবং পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় মানব জাতিকে বুদ্ধি বিবেক, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সকল ক্ষমতা দিয়েছি। আর তাই পৃথিবীতে যারা আমার প্রদেয় ক্ষমতা উপযুক্ত প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ভাল কাজ করে তারাই আমার রাজ্যে এসে স্থান পাবে। আর যারা খারাপ কাজে জড়িত তারাই থুরাইফোং এসে স্থান পাবে না এবং আসতে পারবে না। বরং তারা মাইসিংগ্রেন (নরক) এ যাবে। তবুও বিশ্বাস করলেন না তার সহধর্মিনী। তখন থুরাই তার সহধর্মিনীকে বিশ্বাস করানোর জন্য পৃথিবীতে চাংক্রানপা-নি দুজন লোক পাঠালেন। একজন পুরুষ আর একজন নারী। ওরা দুজন স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর বয়স আশি আর স্ত্রীর বয়স পনের বছর।

চাংক্রানপা-নি ওরা দু'জন ধর্মকর্ম করার উদ্দেশ্যে কিয়ং (উপসনালয়) এ সবার সাথে একই সঙ্গে যাচ্ছে তার বুড়ো স্বামী হাঁটার সহায়ক হিসেবে হাতে লাঠি নিয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বুড়ো স্বামীর পেছনে পেছনে ধীরগতিতে আনন্দের সাথে হেঁটে যাচ্ছে। এমন সময় চাংক্রানপা-নি মেলায় এবং কিয়ং এ আসা লোকেরা ঐ দম্পত্তির প্রতি অবাধ হয়ে তাকিয়ে দেখছে। আর এ অবস্থা দেখে একজন লোক বুড়ো স্বামীকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি আপনার কি হয়? উত্তরে বুড়ো লোকটি বলল, উনি আমার বিবাহিত স্ত্রী এবং তার স্ত্রীও একটু লজ্জার কণ্ঠস্বরে বুড়ো লোকটিকে নিজের স্বামী বলে দাবি করল। তখন লোকটি অবাধ হয়ে বলে মেয়েটি আপনার স্ত্রী! তারা প্রথমে ঐ দম্পত্তিকে দেখে দাদু নাতনী বলে মনে করেছিল। কিন্তু যখন জানতে পারল ওরা দুজন স্বামী-স্ত্রী তখন তাদের দেখে অনেকে উপহাস, হাসি-ঠাট্টা হেয়প্রতিপন্ন করতে লাগল। আবার অনেকে হিংসা ও প্রলোভনে পতিত হল। তবে একজন

লোক প্রতিবাদী স্বরে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, তোমরা ঐ দম্পত্তিকে উপহাস করো না, কারণ ঐ যুবতী স্ত্রী লোকটি তার কপালে বুড়ো স্বামী পাওয়ার ভাগ্য লেখা আছে বিধায় সে বুড়ো স্বামী পেয়েছে তাতে হেয়প্রতিপন্ন করার কোন কারণ নেই। তারপর তারা যে যার খুশি মত করে কিয়ৎ এবং মেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে লাগল। ঐ দম্পত্তি দুজনও কিয়ৎ এ সময় মত করে গিয়ে পৌঁছল এবং যাবতীয় ধর্মকর্ম, মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে যথাযথ ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পাদন করল।

এবার ফেরার পালা। চাংক্রানপা-নি বিকাল সময় প্রায় ঘনিয়ে এল। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি মিলে সকলে বাড়ির মুখী হয়ে ফিরে যাচ্ছে। বুড়ো স্বামী ও তার স্ত্রীকে নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে। তবুও ঐ দম্পত্তি দুজন সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার গতি যেন বার্ষ্যকতার কাছে হার মানতে হয়। চাংক্রানপা-নি মেলা থেকে ফিরে আসার সময় তারা পথের পাশে একটা নিভৃত ছায়া ঘেরা পুকুর পাড় দেখতে পেল। পুকুরটি প্রায় পানি শুকিয়ে গেছে। সে পুকুরের মধ্যে মাঝারি আকারে দুটি টঙদাম (মাগুর মাছ) ছিল। ঐ টঙদামকে ধরার জন্য পুকুর পাড়টি উপচে পড়া ভিড় এবং ধরার তাগিদে সবাই পানিতে নেমে পড়ল। তারপর ঐ পুকুরের টঙদাম দুটিকে ধরার জন্য সকলে ব্যস্ত এং অনেকক্ষণ চেষ্টা করল। কিন্তু টঙদাম দুটি একটি ও কারো হাতে ধরা পড়ল না। কারণ ঐ চাংক্রানপা-নি অন্তত সবার মনটা পবিত্র থাকে। কিন্তু তাদের অনেকের মধ্যে সে সৎ উদ্দেশ্যে ছিল না। টঙদামকে ধরে নিয়ে বাড়িতে রান্না বা ভাজা করার কুচিন্তা ছিল ওদের মধ্যে। আসলে থুরাই তাদেরকে চাংক্রানপা-নি সৎ উদ্দেশ্যমূলক চিন্তা পরীক্ষা করার জন্য টঙদাম দুটিকে কাদা মিশ্রিত ঘোলা পুকুর পানিতে রেখে দিয়েছিলেন। তাই টঙদাম দুটি শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে ধরা পড়ল না। অপর দিকে সূর্যটি ডুবোডুবো অবস্থা করছে, সন্ধ্যা প্রায় নেমে আসছে। তারা টঙদামকে না পেয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং সকলে বাড়ির অভিমুখে চলে গেল। কিন্তু অসহায় টঙদাম দুটি পর মুহূর্তে কারো অনুগ্রহের পাত্র-পাত্রী হয়ে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে পুকুরে।

ঠিক পর মুহূর্তে ঐ দম্পত্তি দুজন পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছল এবং তারা ঐ টঙদামে দুটিকে দেখতে পেল। ঐ টঙদাম দুটিকে তাদের দেখে মনে হল তারাই যেন টঙদাম দুটি উদ্ধার কর্তা। এতক্ষণ যেন তাদের পবিত্র হাতের স্পর্শের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। তখন টঙদাম দুটি ক্লান্ত অবসাদে কাদা মিশ্রিত ঘোলা পুকুর পানিতে উপর দিকে মাথা রেখে অস্বিভজন গ্রহণ করছে। সে অবস্থা দেখে স্ত্রী লোকটি বুড়ো স্বামীকে বলল, ওগো চলো আমরা ঐ অসহায় দুটি টঙদামকে ধরে নিয়ে অন্য কোথাও পানি ভরা বড় জলাশয়ে ছেড়ে দিয়ে আসি, তাহলে টঙদাম দুটি উপকৃত হবে এ বলে তার বুড়ো স্বামী ও সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল এবং ঐ দম্পত্তি দুজন পুকুরে নেমে পড়ল। তখন টঙদাম দুটি অসহায় অবস্থায় দম্পত্তির দুজনের হাতে ধরা পড়ল এবং তারা পানি ভরা বড় জলাশয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ টঙদাম দুটিকে জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়ার পর তারা দেখতে পেল টঙদাম দুটি মহাখুশি হয়ে অন্যত্র কোথাও চলে গেল বহুদূরে এবং ঐ দম্পত্তি দুজনও মনের প্রশান্তিতে চিরতরে থুরাইফোং আরোহণ করল।

ছাড়-অ হালারোগ

শ্ৰীমতী চাকমা

একদিন হৃদক সুখ এল আমা এ জীং হানি
একদিন হৃদক দোল এল আমা এ মনানি
ন এল হোন রেজেরেজে
ন এল হোন হানাহানি ।

সে দিনোন যিয়োন হৃদু আহ-ঝি
এবং সে দিনোন আর ফিরে পেবং নি!
মনবল আমা বেগর আগে
মনানি এজ ন' ভাঙে
পেবার আছজা রাগেই
এজ বুগত সাহস বানি মুজভেদি উজে যেই...

ইঁজ ঠিক গড়ি তো গেল ভুলানি ঝাদি ঝাদি,
জাদ ইদু হালারোগ যদি ধরি থাই,
দারু হেই ছাড়ি ল যোগ ঝানি ।
জাঙার যদি বদি থাই,
ঝাড়ি ফেল জাঙার আনি ।
ঝুমোর গোদা মানুঝ যিদু যান যিদু থান
থেই পারণ যেন নিরিবিলি ॥

এজ এজে বিঝু দিনোদ
পুরনো হাজর ভাজে দিই সাগরত
বিঝু ফুল সমারে...
নূ অ বঝরর নূ-অ দিনর নূ-অ গড়ি মনানি,
ছাড়ি ল হালারোগ, ঝাড়ি ফেল জাঙার-আনি
ভাজি যেব দুগ সুখ অব জীংহানি ॥

রাক্ষসের গল্প তুমসাই ত্রো

একদা সুখ ও শান্তিতে বাস করতে লাগল এক ত্রো আদিবাসী দম্পতি। কিন্তু তাদের মনে কোন দুঃখের সীমা ছিল না। কারণ এ পর্যন্ত তাদের কোন সন্তান জন্মায়নি। তাদের পেশা ছিল জুম চাষ। একদিন তারা গ্রাম থেকে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলে জুম চাষ করতে গেল। দীর্ঘ অনেক বছর পর তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হল। স্ত্রী গর্ভবতীর কথা শুনে স্বামী খুবই আনন্দিত হল। তাই গর্ভবতী স্ত্রীর কথা চিন্তা করে তাঁর স্বামী জুমে অবস্থান করার জন্য প্রস্তাব করল। তাতে তার স্ত্রীও সম্মতি জ্ঞাপন করল। জুম চাষের জন্য সুযোগও তাদের বেশ বেড়ে গেলো। দিন যত ঘনিয়ে আসছে তত তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময়ও ঘনিয়ে আসছে। একদিন রাতে স্ত্রী স্বামীকে টক জাতীয় ফল খাওয়ার ইচ্ছা অভিব্যক্ত করল। স্ত্রীকে টক ফল খাওয়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতি দিল। পরবর্তী দিন স্ত্রীকে টক জাতীয় ফল (আমলকী) খাওয়ানোর জন্য সকালে বের হল। তার স্ত্রী জুমের টং ঘরে (জুমের মাচাং ঘর) অবস্থান করল। তাঁর স্বামী আমলকী পারার জন্য গাছের উপর উঠতে গিয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল এবং সেখানে মারাও গেল। ঐ সময় সন্ধ্যা প্রায় নেমে আসল। এদিকে স্বামীর জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে করতে স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণাও বেড়ে গেল এবং সে ছটপট করতে লাগল। সে রাত ছিল অমাবস্যার রাত। চারদিকে ঘনকালো অন্ধকার। চোখে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সে। জুমের আশেপাশেও কেউ নেই, একা একা সম্পূর্ণ স্বামী যে গেল আর ফিরে এল না। সে বিপদ সংকুল মুহূর্তে তার স্ত্রী বাচ্চা প্রসব করল এবং দুই যমজ সন্তানের মুখ দেখতে পেল। শুধু তার স্বামী দুই যমজ সন্তানের মুখ দেখতে পেল না। আর আমলকী ফলও তাঁর স্ত্রীকে খাওয়ানো হল না। দুই যমজ সন্তানকে কোলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী খুবই চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল, তাঁর স্বামী বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না। অপরদিকে মৃত স্বামী জীবিত হয়ে উঠল। কিন্তু মানুষ বা তার স্বামী রূপে নয়, রাক্ষসে রূপান্তরিত হল পুরো শরীরটি। তার স্ত্রী দুই যমজ সন্তানকে কোলে নিয়ে তার স্বামীর জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। এমন সময় সে দেখতে পেল একজন লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কোন রকম শব্দ করল না। যতদূর সামনে এগুচ্ছে ততই তার বিকৃত চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার দু'চোখে ছিল উত্তপ্ত আগুনের মত লাল, এলোমেলো চুল, হাতির গুরের মত তার দাঁত, অস্বাভাবিক উচ্চতা কী ভয়ংকর চেহারা। তখন তার স্ত্রী বুঝতে পারল সে তার স্বামী নয় রাক্ষস এবং তাকে আক্রমণ করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন তাৎক্ষণিকভাবে স্ত্রী লোকটি চিন্তা করল আমাকে এভাবে বসে থাকলে চলবে না বরং বাঁচতে হবে। তাই স্ত্রী লোকটি টং ঘরে রাক্ষস আসতে না আসতে ঘরের চালের চনের ভেতর সন্তান দুটিকে লুকিয়ে রেখে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেল এবং জুমের তুলসী বাগানে নিজে গিয়ে আত্মগোপন করল। কথিত আছে আদিবাসীদের গ্রামে কোন ছেলে মেয়ে অসুখ-বিসুখ হলে শুকনো তুলসী চুলাতে পোড়ালে, তাতে ভূত-প্রেতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। তাই প্রত্যেক জুমে তুলসী গাছ লাগানো হয়। একদিকে তার বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে ভেসে আসল অপরদিকে রাক্ষসের ভয়ে কি করবে অসহায় স্ত্রী লোকটি কোন উপায় দেখতে পেল না, অন্তরের মধ্যে অন্তরদাহ হল, কিন্তু তার আত্মগোপন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ইতোমধ্যে রাক্ষসটি বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনে প্রথমে টং ঘরে উঠে বাচ্চা দুটিকে ক্ষুধাত বাঘ যেমন তার শিকারী পশুকে খায় তেমনি করে রাক্ষস বাচ্চা দুটিকে খেয়ে ফেলল। তারপর সে রাক্ষসটি তার স্ত্রীকে চারদিকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও খুঁজ মেলেনি। তখন প্রায় ভোর হয়েছে, রাক্ষসটি তুলসী গঙ্গ সহ্য করতে

না পেরে আবার আগের জায়গায় গিয়ে মৃত শরীরের সাথে মিশে গেল। সে রাক্ষসটি রাতের বেলায় জীবিত হয়ে উঠে আর দিনের বেলায় মারা যায়। গ্রাম থেকে জুমের দূরত্ব ছিল অনেক দূর। তাই তাকে জুম থেকে একদিনে পালিয়ে আসা সম্ভব নয়। এজন্য সে সেখান থেকে পালিয়ে এসে গ্রামে পৌঁছতে না পেরে পথের মাঝখানে একটা বিহারে রাত যাপনের জন্য আবার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জনমানব শূণ্য সে বিহারে কোন লোকজন ছিল না। সে বিহারে বাস করত একজন রাক্ষস ভাস্তে। সে রাক্ষস ভাস্তে রূপ ধারণ করে বিহারে বাস করত কিন্তু সে অসহায় মহিলাটির এ ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না। তাই সমস্ত ঘটনা ভাস্তেকে খুলে বলল এবং আশ্রয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। সে রাক্ষস ভাস্তে অসহায় মহিলাটিকে তার বিহারে থাকার জন্য অনুমতি প্রদান করল। অপরদিকে তার স্বামী রাক্ষসটি সন্ধ্যায় আবার মৃতদেহ থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠল এবং স্ত্রীকে খুঁজতে আবার সে বিহারের দিকে এগিয়ে এল। খুঁজতে খুঁজতে সে রাক্ষসটিও বিহারে এসে উপস্থিত হল এবং ভাস্তেকে জিজ্ঞেস করল ভাস্তে এদিকে কোন মহিলাকে আসতে দেখেছেন কিনা? তখন উত্তরে ভাস্তে বলল, হ্যাঁ এসেছে সে এখন আমার বিহারে। তখন সে রাক্ষসটি ভাস্তেকে অনুরোধ করে বলল তাহলে আপনি দয়া করে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। কিন্তু সে রাক্ষস ভাস্তে মহিলাটিকে নিজের শিকারী বলে দাবি করতে লাগল। একপর্যায়ে তাদের বাক বিতর্ভাবের শব্দ সে মহিলাটি শুনে ফেলল এবং সেখানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করল না সেখান থেকে পালিয়ে আরেকটা আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিল। গভীর রাত চারদিকে নিরব নিস্তব্ধ। সে আশ্রমে অনেকগুলো ছেলে বিদ্যার্জন করত। সেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের তার সমস্ত বিপদের ঘটনাগুলো খুলে বলল। মহিলার অসহায়ত্বের ঘটনাগুলো শুনে তারা তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করল। বিহারের মধ্যে দু'রাক্ষস শিকারী মহিলাটির জন্য প্রচণ্ড রকমে ঝগড়া করল এবং একপর্যায়ে একে অপরকে মারতে লাগল। সেখানে বিহারে অবস্থানকারী রাক্ষস ভাস্তে জিতে গেল এবং মহিলার স্বামী মারা গেল। তারপর ক্ষুধার্ত ভাস্তে মহিলাটিকে খাওয়ার জন্য বিহারের ভিতরে প্রবেশ করল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

আবার মহিলাটিকে খুঁজ করার জন্য রাক্ষস ভাস্তে বিহার থেকে বেরিয়ে গেল এবং খুঁজতে খুঁজতে সে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন আশ্রমের গুরুজী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিলেন। সে রাক্ষসটি আশ্রমের ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, এদিকে কোন মহিলা এসেছে কিনা? উত্তরে তারা বলল না আসেনি। তখন রাক্ষস বুঝতে পারল তারা তাকে মিথ্যা কথা বলছে তাই তাদের ভয় দেখিয়ে রাক্ষসটি আবার বলল, তোমরা সত্য কথা বল নয়তো তোমাদের সকলকে আমি খেয়ে ফেলব। তখন ছেলেরা একটু ভয় পেল। এতক্ষণ মহিলাটিকে প্রাণে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা করা বলেছিল কিন্তু এখন ভয়ে মহিলাটিকে রক্ষা করতে পারল না। তাই স্বীকার করল এবং মহিলাটিকে আর প্রাণে রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। তখন রাক্ষসটি বলল, মহিলাটিকে আমার কাছে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও। ভিত্তি ছেলেরা মহিলাটিকে আশ্রম থেকে বের করে দিল এবং রাক্ষসটির কাছে পাঠিয়ে দিল। অসহায় মহিলাটি কোথাও প্রাণে রক্ষা পেল না। ক্ষুধার্ত রাক্ষসটি মহিলাটিকে খেয়ে ফেলল এবং সে বিহারে আবার চলে গেল। অতপর বাথরুম থেকে গুরুজী বের হল এবং সমস্ত ঘটনা ছেলেদের নিকট জানতে পারলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে গুরুজী খুবই মর্মান্বিত হলেন এবং ঐ রাক্ষসটিকে মেরে ফেলার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। তারপর গুরুজী ধীরে ধীরে সে পুরাতন বিহারের দিকে ছুটতে লাগল। আর গুরুজী রাক্ষসটিকে তার বিদ্যাশাস্ত্র মন্ত্র দিয়ে বন্দি করলেন এবং তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললেন। সে রাক্ষসটি আর জীবিত হয়ে উঠতে পারল না। সেখানকার রাক্ষসের আস্তানা ধ্বংস করল এবং গুরুজী আবার চলে গেল।

শ্রো গান

দুঃখিনী গান

রূনপাও শ্রো

ভ্রুকপাত্তদি দুনিপ্রেন কই
সংতই রুরাম সংদ সুছম্ লাই
মোনাং উতাং নাম্‌উ প্য টুংকেং দই
মোনাং পাতাং নাম্‌পা প্য টুংকেং দই
নাম্‌উ-রিংলট নাম্‌পা রিংলট
সংকদ্য কম্‌কুক টিংপুক মাছং লক রোয়া দই
মোন্নাং থিরুই মোন্নাং থিপং তাইসিন ঝম-প্য
নিডং তপং সেট্‌সি কিয়ংরেং ইয়া
টুম ক্লাং থি নিয়ং ক্যঙ
পা লাং থাক্‌ তিং রিয়া-টা
রিয়া ছং বন্‌ লন্‌ ।

লেখা আহ্বান

আসছে ৯ই আগষ্ট ২০০৬ বিশ্ব আদিবাসী দিবস
উপলক্ষে রঁদেভু আবার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে । উক্ত
সংখ্যায় আগ্রহী লেখকদের নিম্নে ঠিকানায় লেখা
পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

ঠিকানা

কর্মধন তনুচংগ্যা

সম্পাদক- রঁদেভু ২১৫ এস আলম কটেজ ১নং গেইট,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ।

লেখক পরিচিতি

- ড. মাহবুবুল হক, সহযোগী অধ্যাপক-বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ড. ময়ুখ চৌধুরী, অধ্যাপক-বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
ড. মহীবুল আজিজ, অধ্যাপক-বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
হোসাইন কবির, অধ্যাপক-লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
শ্রী বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, সাহিত্যিক ও সমাজসেবক, রাঙ্গামাটি।
হাফিজ রশিদ খান, সম্পাদক- ঝিরিঝরনা, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ।
সবুজ তাপস, সাহিত্যিক।
প্রমোদ বিকাশ কারবারী, সাহিত্যিক, রাঙ্গামাটি।
কর্মধন তনুচংগ্যা, ছাত্র-বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
জয়সেন তঞ্চঙ্গ্যা, ছাত্র-যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চ.বি।
মংবাহেন, ছাত্র- ইতিহাস বিভাগ, চ.বি।
মংসাথোয়াই মারমা, ছাত্র-হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, চ.বি।
তর্ক ত্রিপুরা, ছাত্র-যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চ.বি।
বিপাশা চাকমা, ছাত্রী-রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ।
উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা (মনিচান), ছাত্র- পিচ-ব্লেইনড বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
তপতাংশ চাকমা (ব্যবিলন), ছাত্র- মার্কেটিং বিভাগ, চ.বি।
রিনি চাকমা, ছাত্রী- ইতিহাস বিভাগ, চ.বি।
অর্জিতা স্বীসা, ছাত্রী- ইংরেজী বিভাগ, চ.বি।
সুমন চাকমা, ছাত্র- ফরেস্ট্রি বিভাগ, চ.বি।
মোঃ আশিকুর রহমান, ছাত্র-সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চ.বি।
কাইং ওয়াই শ্রো, ছাত্র- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চ.বি।
ফ্লোরিতা চাকমা, ছাত্রী- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চ.বি।
তুমসাই শ্রো, ছাত্রী- শ্রো আবাসিক, বান্দরবান।
রুনপাও শ্রো, ছাত্রী- শ্রো আবাসিক, বান্দরবান।

বাংলা নববর্ষ - ১৪১৩ উপলক্ষে 'রুঁদেভু' প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই

রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুসম্পদ, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজসেবা, জনস্বাস্থ্য, সমবায়সহ ১৫টি হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

ড. মানিক লাল দেওয়ান
চেয়ারম্যান
রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
রাজ্যমাটি।

গত ৯ইং আগষ্ট ২০০৫, প্রকাশিত রঁদেভু ৫ম সংখ্যায়
অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান স্যারের একটি লেখা 'প্রিয় অঙ্গনে নির্জন
বেলার স্বর' ছোট গল্প নামে ছাপা হয়। এটি আসলে একটি কবিতা
হিসেবে ছাপানো কথা ছিল। অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

স ম্পাদক

সবাইকে
বিঝু-বিঝু-বৈসুক-সাংখাই-চাংক্রানের
শুভেচ্ছাসহ ভালোবাসা



‘রঁদেভু’

রঁদেভু প্রকাশনা পর্ষদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়